ম্যালেরিয়া মুক্ত করার বৈশ্বিক অঙ্গীকার রয়েছে বাংলাদেশের

ইকরামুল কবির

২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করার বৈশ্বিক অঙ্গীকার রয়েছে বাংলাদেশের। ম্যালেরিয়া বাংলাদেশে অনেকটাই নির্মূল হয়েছে। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এখনো ম্যালেরিয়া রয়েছে।গত অক্টোবর পর্যন্ত ১৫ হাজারের মতো রোগী দেখা গেছে। এটা গত বছরের দ্বিগুণের বেশি এবং সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত বান্দরবান জেলায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শুধু ম্যালেরিয়াই নয়, অনেকগুলো রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংক্রামক রোগ নির্মূলে সাফল্য দেখিয়েছে। করোনা নিয়ন্ত্রণেও তাদের সাফল্য শুধু দেশে না, দেশের বাইরেও নানাভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। ম্যালেরিয়া সেই অর্থে সংকুচিত হলেও আমাদের জন্য বড়ো ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে এখনো রয়ে গিয়েছে।ম্যালেরিয়া নির্মূলের লক্ষ্য অর্জন করে চীন সফলতা দেখিয়েছে।ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে হলে শুধু দেশের সকল জেলাকে বিবেচনায় নিলেই হবে না,আমাদের পার্শবর্তী দেশগুলোর বিশেষ করে সীমান্ত এলাকার ম্যালেরিয়া পরিস্থিতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। চীন ম্যালেরিয়া সংক্রমণ শূন্যে নামিয়ে এনেছে ওয়ান-থ্রি-সেভেন ফর্মূলা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমাদেরও এই ফর্মূলায় কাজ করতে হবে। যেদিন রোগ শনাক্ত হবে তার তিনদিনের মধ্যে দুই ধরনের সার্ভিল্যান্স হবে। একটি এন্টোমোলজিক্যাল, অন্যটি এপিডেমিওলজিক্যাল। আর সাতদিনের মধ্যে অবশ্যই চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এই ওয়ান-থ্রি-সেভেন ফর্মূলা যদি সারা দেশে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে চালু করা যায়, তাহলে যেসব এলাকায় প্রাদুর্ভাব বেশি সেটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। চীন যদি ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি থেকে শূন্যে আনতে পারে, তাহলে আমাদের জন্যও তা অসম্ভব নয়।

বাস্তবতা হলো গত এক দশকে বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া সমস্যা ক্রমান্বয়ে সমাধানের দিকে গেছে। তবে বান্দরবানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর মধ্যে তিনটি উপজেলা আলীকদম, থানচি ও লামায় এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। বহুসংখ্যক মানুষ সেখানে আক্রান্ত। এ রোগীরা আবার দুর্গম এলাকায় বসবাস করে। এদের মধ্যে জুমচাষির সংখ্যা বেশি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু মানুষ রয়েছে যাদের চিকিৎসা গ্রহণের ধরন আমাদের তুলনায় ভিন্ন। এছাড়া আছে কিছু ভ্রাম্যমাণ মানুষ। এখন ম্যালেরিয়ায় মোট আক্রান্তের তিন চতুর্থাংশ আসে বান্দরবান থেকে। এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বের অন্য দেশগুলো কী করেছে, তা জেনে সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি গাইডলাইন আছে। এ গাইডলাইনের মাস স্ট্র্যাটেজি আছে। টার্গেট স্ট্র্যাটেজিও আছে। কোনো কোনো জায়গায় এগুলোকে সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। কৌশল যাই হোক না কেন দেশেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই নীতিতে মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারলে সফলতা আসবে।এক্ষেত্রে প্রথমে মানুষকে জানাতে হবে। স্বাস্থ্যগত প্রভাব ছাড়াও এর কিছু অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। সেটা বোঝাতে হবে। তাহলে আমরা ভালো ফল পাওয়ার আশা করতে পারি। অন্তত বান্দরবানে দ্রুত সমাধান জরুরি, কেননা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানেই আক্রান্তের হার বেশি। অর্থাৎ এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ। ম্যালেরিয়া নির্মূল করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। জুমচাষি, কাঠুরে অর্থাৎ যারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করতে যায় তারা বেশি আক্রান্ত হয়। নারীর তুলনায় পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। ১৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তারাও বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। এ তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এসব তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায় আক্রান্তরা বেশিরভাগই মোবাইল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার। আশার বিষয় হলো খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সংক্রমণ ও মৃত্যু কমেছে। অন্যদিকে এ বছর কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে মৃত্যু বেড়েছে। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ক্যাম্পে কেসের পরিমাণ বেশি দেখা যাচ্ছে। কক্সবাজারের যেসব মানুষ বাঁশ কাটতে গভীর বনে যায়, তারা দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে। তাদের অনেকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এসব মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর্মীর মোবাইল নম্বর দেয়া যেতে পারে, যাতে জ্বর হলে দ্রুত যোগাযোগ করে তারা চিকিৎসা নেয়। এতে মৃতের সংখ্যা হয়তো কমে আসবে। করোনার সময়ে কক্সবাজারে তেমন কর্মসংস্থান না থাকায় অনেক মানুষ বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলায় জীবিকার তাগিদে কাজ করতে গিয়েছেন। অধিকাংশ রোগী সেখান থেকে শনাক্ত হয়েছে। না জানার কারণে তারা সেখানেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এবং জ্বর নিয়ে দীর্ঘদিন বসে ছিল। যখন জ্বর মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন তারা কক্সবাজারে চলে এসেছে। তারপর প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে। তখন ডেঙ্গু, করোনা বা টাইফয়েড হিসেবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে, যাতে সময়ক্ষেপণ হয়েছে। এতে মৃতের সংখ্যাটা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। একইভাবে চট্টগ্রামেও সেটা লক্ষ করা গেছে।

জুমচাষিরা যখন চাষ করতে বনে যায় তারা পরিবার নিয়েই যায় এবং প্রায় তিন মাস সেখানে বসবাস করে। এছাড়া কাঠুরে বা অন্যান্য যারা কাজের সূত্রে বনে যায় পূর্ণ আচ্ছাদিত পোশাক ও মশারির ব্যবহারে অনাগ্রহের কারণে তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বেশি। এছাড়া অশিক্ষা, কুসংস্কারের কারণে তারা ডাক্তারের কাছে যায় না। ওঝার কাছে চিকিৎসা নেয়। এ ধরনের নানা কারণে তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি।

ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে হলে আমাদের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতেই হবে। বিশেষায়িত কোনো পোশাক তাদের দেয়া যেতে পারে। চট্টগ্রামে আরবান ম্যালেরিয়া তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে আরবান ম্যালেরিয়া ছিল না। এটি শুরু হলে ঢাকাও হুমকির মুখে পড়ার সম্ভনা রয়েছে। মশা মারার জন্য বহুদিন ধরে ডেল্টামেথরিন ব্যবহার হচ্ছে। কৃষকরাও এগুলো ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যবহারটি অনিয়ন্ত্রিত। ফলে এ কীটনাশকটির ক্ষেত্রে মশার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে আছে, তা গত কয়েক দশকে গৃহীত নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণের কারণে পাহাড়ে সমতল থেকে কর্মী গেছে। এখন সেখানে স্বাস্থ্যকর্মী ও উন্নয়ন-সহযোগীরা সহজে যেতে পারছে যার ফলে আমরা এর সুফলও দেখছি।

জলবায়ু সংকটেরও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বড়ো প্রভাব রয়েছে। সংক্রামক, অসংক্রামক, মানসিক স্বাস্থ্য সবক্ষেত্রেই। সংক্রামক ব্যাধিগুলো বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই। কিছু বিষয়কে যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়, তাহলে এখনই সতর্ক হতে হবে।কিছু সাইলেন্ট ক্যারিয়ার আছে, যারা উপসর্গবিহীন। তাদের চিহ্নিত করা ও ম্যাস ট্রিটমেন্টে আনা দরকার। সুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিরোধ খুবই জরুরি, যেন কাউকে হাসপাতালে যেতে না হয়।

সরকারি ও বেসরকারি যৌথ সহযোগিতায় কমিউনিটি এনগেজমেন্টের দৃষ্টান্ত ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই। ৯৪ শতাংশ ম্যালেরিয়া কমেছে। মৃত্যু কমেছে ৯৩ শতাংশ, সিভিয়ার ম্যালেরিয়া নেমে এসেছে ৩ শতাংশে। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশ এলাকায় কীটনাশকযুক্ত মশারি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দুটোই কমে এসেছে। সারা দেশের মোট ৯১ শতাংশ রোগীই শনাক্ত হয় বান্দরবান থেকে। এর মধ্যে রামু, থানচি, আলীকদম থেকে শনাক্ত হয় ৭৫ শতাংশ। শনাক্ত বেশি হলেও এখন মৃতের সংখ্যা কমেছে। রাঙ্গামাটিতে রোগী শনাক্ত ও মৃত্যু দুটোই কমে এসেছে। ম্যালেরিয়া নির্মূলের শেষ পর্যায়ে রয়েছে এ এলাকা। খাগড়াছড়িতে এখন মৃত্যু নেই। শিশু ও নারীরা ছাড়াও প্রসূতিদের মধ্যে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এছাড়া ১৫ বছরের বেশি বয়স্করা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। তবে আগের তুলনায় তা এখন কমে এসেছে।

২০৩০ সালের মধ্যেই আমদের ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে হবে। গত তিন বছরে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলায় ম্যালেরিয়া শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে আক্রন্তের হার শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। আর এ জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

#

পিআইডি ফিচার